দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য

একটি প্রদেশে বা রাষ্ট্রে বা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাষার ধ্বনিগত এবং রূপগত ঐক্য সাধারণভাবে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রদেশ বা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে বা একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী অংশের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান, সামাজিক জীবনে পারস্পরিক বিনিময় এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগের উপর। এই আদানপ্রদান, বিনিময় এবং সংযোগের অভাবে একটি ভূখন্ডে প্রচলিত ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষার উদ্ভব ঘটে। ভাষাতত্ত্ববিদ অটো জেসপারসন-এর মতানুসারে ভাষা থেকে উপভাষার জন্মের কারণ-" ... not purely physical but want of communication for whatever reason... এবং ...linguistic unity depends always on intercourse, on a community of life. "।[১] ভাষার রূপ এবং ধ্বনিগত একরূপতার মূলে বাচকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং সন্নিধির গুরুত্বকে সি, এফ, হকেট-ও স্বীকার করেছেন।[২] তবে একটি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ভাষার ঐক্য সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পারস্পরিক আদানপ্রদানের উপরেই শুধু নির্ভরশীল এবং এই সংযোগের বা আদানপ্রদানের অভাবেই একটি ভাষা থেকে একাধিক উপভাষার জন্ম হয়, এমন যদি বলা হয় তাহলে বিষয়টি সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের উত্তর অমুক্ত থেকে যায়। একটি অঞ্চলের অধিবাসী মানুষেরা একই ভাষাভাষী এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হলেও রাজনৈতিক ভাবে সেই অঞ্চলটি যদি বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিভাজিত প্রত্যেকটি অংশে যদি পৃথক পৃথক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে একটি অখন্ড বাকসম্প্রদায় এভাবেই বিভক্ত হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে এইভাবে বিভাজিত বাকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের ব্যবহারে একই ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক চারিত্র্য অর্জন করতে থাকে। এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড-এর অভিমত নিম্নরূপ।-" It is contained that, under older conditions, a new political boundary led in less than fifty years to some linguistic difference"।[৩] এই কারণে একটি অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক বন্টন সেই অঞ্চলের ভাষাগত ঐক্য বা বিভিন্নতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ দেখা

---

(১) জেসপারসন অটো, ম্যানকাইন্ড: ন্যাশান অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল, পৃঃ ৪১, ৪৬

(২) হকেট, সি, এফ, ইনট্রোডাকশন টু লিঙ্গুইস্টিকস, লেসন-৫, আয়ুনকট্রিক

(৩) ব্লুমফিল্ড, এল, ল্যাংগুয়েজ, লন্ডন, ১৯৬১, পৃঃ ৩৪৩

গিয়েছে যে একই শাসনব্যবস্থা বা সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলে ভাষার দিক থেকে এক ধরনের সাম্যতা বজায় থাকে। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড-এর মতে-" Apparently, common goverment and religion and especially the custom of inter marriage within the political unit, led to relative uniformity of speech".[৪]

গোয়ালপাড়া জেলা বর্তমানে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। কিন্তু এক সময় এই জেলা এবং কামরূপ জেলার কিছু অংশ প্রাচীন কামরূপ বা কামতাপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্ব আসামের সঙ্গে এই দুটি জেলার রাষ্ট্রনৈতিক সংযুক্তি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ঘটনা। তার আগে উল্লিখিত দুটি জেলার অধিবাসীরা পূর্ব আসামের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী অহোম [illegible] রাজবংশকে বহিরাগত বলে ভাবত। সমানভাবে অহোমরাও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখত।[৫] অর্থাৎ একসময় পূর্ব আসাম এবং গোয়ালপাড়া ও কামরূপ রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে দুটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ফলশ্রুতিতে এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য কোনোদিনই স্থাপিত হয়নি। গ্রীয়ারসন পূর্ব ও পশ্চিম আসামের মধ্যেকার এই ভাষাগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে।[৬] এই পার্থক্যের ভিত্তিতে ডঃ বাণীকান্ত কাকতি শিবসাগর জেলা সহ আসামের পূর্ব সীমান্তবর্তী জেলা সদিয়া থেকে গৌহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ভাষাকে পূর্ব অসমীয়া বা 'ইস্টার্ন অ্যাসামীজ' এবং পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলা কামরূপ এবং গোয়ালপাড়ার ভাষাকে পশ্চিম অসমীয়া বা 'ওয়েস্টার্ন অ্যাসামীজ' বলে চিহ্নিত করেছেন।[৭] ডঃ উপেন্দ্র নাথ গোস্বামীও এই পার্থক্যকে স্বীকার করেছেন এবং পূর্ব আসামের সঙ্গে পশ্চিম আসামের রাষ্ট্রনৈতিক পার্থক্যকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[৮] পরন্তু তিনি নিম্ন আসামের ভাষা, বাণীকান্ত কাকতি কথিত পশ্চিম অসমীয়া বা 'ওয়েস্টার্ন অ্যাসামীজ'-কে কামরূপী উপভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন।[৯] এই 'ওয়েস্টার্ন অ্যাসামীজ' বা পশ্চিম অসমীয়ার সঙ্গে কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ পার্থক্য থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ে দুটি অঞ্চলের ভাষার মধ্যে অধিক সাদৃশ্যও বর্তমান।

---

(৪) তদেব, পৃঃ ৩৯৩

(৫) ভূঞা, এস,কে, অ্যাংলো অ্যাসামীজ রিলেশনস্, পৃঃ ৬৭

(৬) গ্রীয়ারসন জি,এ, লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯৬৮, ভল্যুম-৫, পার্ট- ১, পৃঃ ৩৯

(৭) কাকতি বাণীকান্ত, অ্যাসামীজ, ইটস ফরমেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, ১৯৭২, পৃঃ ১৮-১৯

(৮) গোস্বামী উপেন্দ্র নাথ, এ স্টাডি অন কামরূপী, এ ডায়লেক্ট অব অ্যাসামীজ, ১৯৭০, পৃঃ ১১-১৪

(৯) তদেব, পৃঃ ৯-১১

নৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে একীভূত[illegible]।

এই তিনটি বিভাগের মধ্যে একমাত্র বিভাগ কামরূপ বা কামতাপুর বর্মণ রাজবংশের খ্যাতনামা রাজা ভাস্করবর্মার শাসন থেকে কোচ রাজবংশের মধ্যবর্তী পুরুষদের রাজত্বকাল পর্যন্ত তার পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। ভাস্করবর্মার রাজত্বকালের সূত্রপাত আনুমানিক ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রাজত্বকালেই চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসেন এবং কামরূপে এসে সেই অঞ্চলের এভাষা সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন, যার সূত্র ধরে ভাষাতাত্ত্বিকরা উত্তরবঙ্গ এবং আসামে আর্য-ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সন্ধান পেয়েছেন। ভাস্করবর্মার রাজত্বকাল সমাপ্ত হওয়ার পরে কামরূপে একাধিক রাজবংশ রাজত্ব করে। বিভিন্ন বংশের রাজত্বকালে কামরূপ রাজ্যের সীমা একাধিকবার পরিবর্তিত হয়। কোচ রাজবংশের অষ্টম রাজা নরনারায়ণ তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যের পূর্বভাগের শাসনভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের হাতে অর্পণ করেন। এর ফলে পূর্বকামরূপ একটি পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোচবিহার রাজবংশের সঙ্গে [illegible] শুক্লধ্বজের পরবর্তী বংশধরদের সদ্ভাব কোচ রাজবংশের মধ্যবর্তী পুরুষদের শাসনকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। একারণে বলা যেতে পারে যে অন্ততঃ এই সময় পর্যন্ত কোচবিহার (কামতাপুর বা কামরূপের অর্বাচীন নাম) বা কামরূপ রাজ্যের রাষ্ট্র-নৈতিক ঐক্য অক্ষুণ্ন ছিল। উত্তরবঙ্গের অপর একটি বিভাগ পুণ্ড্রবর্ধনের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব গুপ্ত শাসনকাল পর্যন্ত বজায় থাকলেও এর পরবর্তী সময়ে তা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এই বিভাগটি কখনও কামরূপ, কখনও বা গৌড়ের শাসনের আওতায় আসে।

পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি বিভাগের ইতিহাসের আলোচনা না করে একটিমাত্র বিভাগ কামরূপের ইতিহাসের আলোচনা করার সময়ে আমরা তিনটি বিভাগেরই শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আনুমানিক ৬০২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভাস্করবর্মা কামরূপের শাসনভার গ্রহণ করেন। পূর্বভারতের রাজনৈতিক ঘটনায় তিনি বিশেষ প্রভাব তৈরী করতে সক্ষম হন। তাঁর রাজত্বকালের অবসান ঘটে আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সামরিক আঁতাত স্থাপন করে গৌড় আক্রমণ। গৌড়ের তদানীন্তন শাসনকর্তা শশাঙ্ক এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এর পরে শশাঙ্ক এবং তৎপুত্র মানবের মৃত্যুর পরে ৬৪২/৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্করবর্মা পুনরায় গৌড় আক্রমণ করেন এবং প্রায় বিনাযুদ্ধে গৌড় রাজ্যের পূর্বভাগ সহ পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্য নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিব্বত রাজের আক্রমণে [illegible] পৌণ্ড্রবর্ধন কামরূপের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জয়নাগ নামে একজন রাজা কামরূপে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনুমান করা হয় যে

এই রত্নপালের আমলে পৌণ্ড্রবর্ধন আবার কামরূপের অধিকারে এসেছিল। এইভাবে পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একাধিকবার পরিবর্তিত হতে হতে এক সময় তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে কামরূপ, পৌণ্ড্রবর্ধন এবং গৌড়, এই ত্রিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে উত্তরবঙ্গে দ্বিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার পরে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা হ'ল কামরূপ এবং গৌড়ের সংঘর্ষের ইতিহাস।[১০]

ভাস্করবর্মার শাসনকাল সমাপ্ত হওয়ার পরে পর থেকে শুরু করে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্যাপক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অভাব ও অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। এর পরে গৌড় এবং বরেন্দ্রে পাল শাসনের সূত্রপাত ঘটে এবং আনুমানিক ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে তা সমাপ্ত হয়। অপরদিকে কামরূপে এই সময়, অর্থাৎ ৬৫০ থেকে শুরু করে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শালস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ রাজত্ব করে। বঙ্গে যখন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব রাজত্ব করছেন কামরূপে তখন শালস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত বংশের রাজা [illegible] বনমালবর্মদেবের রাজত্বকাল চলছে। রাজা বনমালবর্মদেব ও বংশধরেরা ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরে কামরূপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে রাজা ব্রহ্মপালের। রাজা ব্রহ্মপাল এবং তাঁর বংশধরেরা আনুমানিক ১১২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন।[১১] এর পরে কামরূপের শাসনক্ষমতা রাজা বৈদ্যদেবের হস্তগত হয়। তিনি আনুমানিক ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'মহারাজাধিরাজ [illegible] পরমেশ্বর পরমভট্টারক' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৈদ্যদেবের শাসনকালের অবসান ঘটে। অপরদিকে বাংলায় তখন সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১২] সেন বংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের শাসন-কালের সমাপ্তিতে বাংলাদেশে মুসলমানী শাসন শুরু হয়। কামরূপে তখন বৈদ্যদেব প্রতিষ্ঠিত বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা পৃথুর রাজত্বকাল চলছে। ভাস্করবর্মার পর থেকে কামরূপের সঙ্গে গৌড়ের উল্লেখযোগ্য কোনো বিবাদের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই সময়ের পর থেকে কামরূপ এবং গৌড়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হয়। পৃথুর রাজত্বকালে, ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘপুরের জায়গীরদার থেকে বাংলার সুলতানে রূপান্তরিত সুলতান ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী তিব্বত আক্রমণের অছিলায় কামরূপ আক্রমণ করলে পৃথু এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর আমলে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ সংঘটিত হয় ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গিয়াসুদ্দিন ইউয়জ শাহ। রাজা পৃথু এই আক্রমণও প্রতিহত করেন।

---

(১০) দাস সুকুমার, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ৬৩-৬৭

(১১) তদেব, পৃঃ ৭৭-৯৯

(১২) তদেব, পৃঃ ৯৪-৯৭

এর পরে কামরূপে তৃতীয়বার মুসলিম অভিযান প্রেরিত হয় ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে। এই যুদ্ধে পৃথু পরাজিত হন এবং তাঁর পুত্র সন্ধ্যা রায় বাৎসরিক করদানের শর্তে সন্ধি করে কামরূপের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। সন্ধ্যা রায়ের সময়ে কামরূপ চতুর্থবার মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয় ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তবে মালিক উজবেগের নেতৃত্বে প্রেরিত চতুর্থবারের এই মুসলিম অভিযানটিও ব্যর্থ হয়। কিন্তু একবার মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করা সত্ত্বেও দৈত্যদেবের বংশধররা কামরূপে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি মূলতঃ রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্রের জন্য। এই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি শেষপর্যন্ত দৈত্যদেব প্রতিষ্ঠিত বংশের সর্বশেষ রাজা সিংহধ্বজকে হত্যা করে তাঁর মন্ত্রী মানিক প্রতাপধ্বজ নাম গ্রহণ করে কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন। এর পরে কামরূপে একাধিক রাজবংশ রাজত্ব করে। এই সব রাজবংশের মধ্যে খেন রাজবংশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের শেষ রাজা নীলাম্বর যখন কাম-রূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন বাংলার সুলতান হলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্। তাঁর সময়ে কামরূপে পঞ্চম মুসলিম অভিযান প্রেরিত হয়। দেখা গিয়েছে যে এর পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযানগুলির কোনোটি আংশিক, কোনোটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এবারের এই পঞ্চম মুসলিম অভিযানের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের পক্ষে যায়। এই যুদ্ধে রাজপুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নীলাম্বর পরাজিত হন এবং এর ফলে কামরূপে সাময়িকভাবে হিন্দু শাসনের অবলুপ্তি ঘটে। এর অল্পকাল পরেই কামরূপের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে কামরূপের একজন সামন্তরাজার পুত্র বিশ্বসিংহ সেখানে কোচ রাজবংশের পত্তন করেন।[১৩]

আনুমানিক ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কোচ সর্দার হাজো, মতান্তরে হরিদাসের পুত্র বিশ্বসিংহ নিজেকে 'কামতেশ্বর' বা পশ্চিম কামরূপের রাজা বলে ঘোষণা করেন।[১৪] এই সময় থেকেই বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে কোচবিহার রাজ্যের (অবশ্য তখনও কামতাপুর বা কামরূপ রাজ্যের নাম কোচবিহার হয়নি) প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়। এই সময় থেকে শুরু করে ভারতভুক্তির সময় পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের আয়তন একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর কোচবিহার রাজ্যের সীমানির্দেশক একটি মানচিত্রে (খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৩৬, পৃঃ ১৬৮) বর্তমান উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং অবিভক্ত দিনাজপুর জেলাকে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বলে ধরা হয়েছে। মালদহ জেলাকে এই মানচিত্রে অনিরূপিত রাজ্যসীমার মধ্যে রাখা হয়েছে। এই

---

(১৩) তদেব, পৃঃ ৯৯-১২৭

(১৪) খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৩৬, পৃঃ ৮৭

মানচিত্রটি রাজা নরনারায়ণের শাসনকালীন কোচবিহার রাজ্যের সীমা নির্দেশ করছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কোচবিহার রাজ্যের সীমানির্দেশক অন্য একটি মানচিত্রে (খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৩৬, পৃঃ ১৬৮) জলপাইগুড়ি এবং বর্তমান দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমাকে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসেবে দেখানো হলেও দিনাজপুর জেলাকে রাজ্যসীমার বহির্ভূত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন সময়ের মানচিত্র থেকে বিভিন্ন সময়ের কোচবিহার রাজ্যের সীমা ও আয়তন সম্পর্কে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাতে একটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া চলে যে রাজ্যের আয়তন নানা সময়ে নানা কারণে পরিবর্তিত হলেও কোচবিহার রাজ্যের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের আগে কখনও বিপন্ন হয়নি। অষ্টাদশ শতকীর শেষভাগে, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের তৎকালীন 'দুগদেব' (রাজা) দেবধুর কোচবিহার রাজ্যের অধিকাংশ ভূভাগ অধিকার করেন। এই সময়ে রাজ্যের বিশিষ্ট প্রজাবর্গ, রাজপুরুষগণ এবং ভুটানে আবদ্ধ রাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ধরেন্দ্র-নারায়ণের অভিভাবকস্বরূপ নাজির খগেন্দ্রনারায়ণ তৎকালীন গভর্নরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ক্যাপ্টেন জোন্স কোচবিহারের হয়ে ভুটিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ভুটিয়ারা পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে শর্তে কোম্পানী ভুটিয়াদের সঙ্গে সন্ধিতে রাজী হয় তা কোনো দিক থেকেই কোচবিহার রাজ্যের পক্ষে লাভজনক ছিল না। এই সন্ধির শর্তানুসারে কোচবিহার রাজ্যের পার্বত্য এলাকা সংলগ্ন অনেক অঞ্চল ভুটিয়াদের দিয়ে দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে কোম্পানী ভুটানের কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়। ফলে এই সন্ধিতে কোচবিহার রাজ্যের কোনো লাভ তো হয়ই না, উপরন্তু এর ফলে কোচবিহার রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতিতে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ ঘটে এবং কালক্রমে পূর্বতন স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোচবিহার ব্রিটিশদের একটি করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হতে বাধ্য হয়।[15] এই ঘটনার ফলে কোচবিহারের মানচিত্রে যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কোচবিহার রাজ্যের একটি মানচিত্র (খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৩৬, পৃঃ ৩৭০) থেকে। এই মানচিত্রে কোচবিহার রাজ্যের আয়তন পূর্ববর্তী মানচিত্রগুলিতে প্রদর্শিত আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট।

কোচবিহারের আয়তনের এই হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে বর্তমান উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চল সাময়িকভাবে কোচবিহারের অধিকারে এলেও সেই অঞ্চলগুলি কোনো সময়ের জন্যই দীর্ঘ-

---

(১৫) তদেব, পৃঃ ৩৩৮-৩৮৭

কাল ধরে কোচবিহারের অধীনে ছিল না। একমাত্র কোচবিহার জেলাই সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রথমতঃ কামতাপুর বা কামরূপ রাজ্যের, শেষতঃ কোচবিহার রাজ্যের স্থায়ী রূপ হিসেবে বজায় থেকেছে। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কোচবিহার অধিকার করলেও তৎকালীন কোচবিহাররাজ এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[১৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোচবিহার রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই শুধু নয়, একটি স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্গত স্বাধীন অঞ্চল হিসেবেও কোচবিহারের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল ধরে বজায় ছিল। পক্ষান্তরে সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল সমূহের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলতঃ রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র কোচবিহারেই ছিল, অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে ছিল না। এই রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার জন্য কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের মুখের ভাষার বিকাশ এবং এবং পুষ্টি যেভাবে ঘটেছে, উত্তরবঙ্গের বাকী এলাকাগুলিতে সেভাবে ঘটেনি। একারণেই কোচবিহারের রাজবংশীদের ভাষা ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষা একই উৎস থেকে জন্ম লাভ করলেও সাম্প্রতিক কালে কিছুটা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকেও কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কিছু কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রধান প্রধান সর্বজনীন উৎসব বা পূজাপার্বণ, যা কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তা অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের মধ্যেও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত উৎসবাদি পদ্ধতিগতভাবে কোচবিহারে অনুষ্ঠিত উৎসবাদি থেকে স্বতন্ত্র। উদাহরণ স্বরূপ নবান্ন বা 'নয়াখাই' অনুষ্ঠানটির কথা বলা যেতে পারে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় নবান্ন অনুষ্ঠানে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা ছাড়াও মনসা দেবীর পূজা অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত। কিন্তু কোচবিহারে এই পূজা স্বতন্ত্রভাবে করা হয়ে থাকে, নয়াখাই অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য অংশ হিসেবে নয়। তাছাড়া জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় নয়াখাই অনুষ্ঠান যতটা গুরুত্বপূর্ণ কোচবিহারে ততটা নয়। জলপাই-গুড়িতে 'তিস্তাবুড়ি পূজা' এবং দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলে 'হোচিমী পূজা' রাজবংশী-দের মধ্যে সর্বজনীন উৎসবের মত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কোচবিহারের রাজবংশীরা এই জাতীয় উৎসবের নাম পর্যন্ত জানেনা। উল্লিখিত উৎসবদুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গান এবং খেলা ইত্যাদিও কোচবিহারে প্রচলিত নয়। পক্ষান্তরে 'খাতোয়াল পাঁঠার খেলা' কোচবিহারে রাজবংশী সমাজভুক্ত কিশোরদের মধ্যে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় খেলা। অন্যান্য জেলাগুলিতে এর প্রচলন নেই। সমানভাবে 'চোর-চুন্নি' নামে এক ধরণের খেলা এবং তৎসংশ্লিষ্ট গান এবং ছড়া জলপাইগুড়িতে প্রচলিত থাকলেও কোচবিহারে এই খেলা

---

(১৬) সরকার, জে, এন, দি লাইফ অব মীরজুমলা, কলকাতা, ১৯৫১, পৃঃ ২২৩-২৩০

এবং তৎসংশ্লিষ্ট গানের প্রচলন নেই।

কোচবিহারের লোকসংগীত এবং লোকনাট্যের চরিত্রও অন্যান্য জেলার থেকে স্বতন্ত্র। ভাওয়াইয়া কোচবিহারের লোকসংগীতের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট এবং শক্তিশালী ধারা। অন্যান্য অঞ্চলে ভাওয়াইয়া গানের প্রচলন ততটা নেই। সম্প্রতি কোচবিহারের সাফল্যে এবং বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রের উদ্যোগে অন্যান্য জেলাগুলিও এই ভাওয়াইয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে চলেছে এবং তৎসূত্রে ভাওয়াইয়া অন্যান্য অঞ্চলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই গীতিধারাটি একান্তভাবেই কোচবিহারের নিজস্ব সম্পদ। এই গানের কথাবস্তুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোচবিহারের রাজবংশীদের ভাষায় যে কাব্যিক বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষায় তা নেই। ভাওয়াইয়া ছাড়া একেবারে কোচবিহারের নিজস্ব গীতিধারাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'দোতরাভাঙার গান', 'কুশানের গান', 'আমদেওয়ান বা রামদেওয়ানের গান' ইত্যাদি। দোতরাভাঙার গানে মূল গায়েনের হাতে থাকে 'দোতরা' নামে একটি বাদ্যযন্ত্র। এই গানের বিভিন্ন পালার বিষয়বস্তু হ'ল বিভিন্ন মুসলমানী কেচ্ছা বা মুসলমান পীর ফকির ইত্যাদির কাহিনী। কুশান গানে মূল গায়েনের হাতে থাকে এক তারবিশিষ্ট 'ব্যানা' নামে একধরণের বাদ্যযন্ত্র। এজন্য স্থানবিশেষে এই গানকে কখনো কখনো 'ব্যানাকুশান'-ও বলা হয়ে থাকে। এই গানের বিভিন্ন পালার বিষয়বস্তু হ'ল রামায়ণভিত্তিক বিভিন্ন কাহিনী। পরবর্তীকালে মহাভারতের কাহিনীও এর বিষয়সীমার অন্তর্ভুক্ত হয়। মনে হয় দোতরাভাঙা এবং কুশান গানের আদি প্রবর্তক [illegible] যথাক্রমে কোচবিহারের অধিবাসী মুসলমান ও হিন্দু সমাজ। কোচবিহারের অধিবাসী মুসলমান সমাজে 'মোর' নামে গীতিব্যবসায়ী একটি শ্রেণী আছে। কোচবিহারে প্রচলিত একটি ছড়ায় দোতরা যে মোরদেরই বাদ্যযন্ত্র এমন কথাও বলা হয়েছে।

"চ্যানা বাজায় ব্যানা,
দোতরা বাজায় মোর
সারিন্দা বাজায় সাত সদাগর
বাঁশি বাজায় চোর"।

এই কারণে আমরা এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছি যে দোতরাভাঙা গানের প্রচলনকারী সম্ভবতঃ কোচবিহারের মুসলমান সম্প্রদায়, যা পরবর্তীকালে রাজবংশী হিন্দুদের একটি নিজস্ব গীতিধারায় পরিণত হয়েছে। এই দোতরাভাঙা এবং কুশান গানের প্রচলন উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় নেই। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এর অন্যতম বিশিষ্ট লোকনাট্য হ'ল 'পালাটিয়া গান'। এই গানের বিভিন্ন পালার বিষয়বস্তু হ'ল বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমসাময়িক

কালে সংঘটিত কৌতুহলোদ্দীপক বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা। তাছাড়া পালাটিয়া গানের পরিচয়'রঙ পাচালি', 'ধান পাচালি', 'মানপাচালি' ইত্যাদি। পশ্চিম দিনাজপুরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকনাট্য হ'ল 'আলকাপ' এবং 'খনগান'। মালদহের পশ্চিম দিনাজপুর সংলগ্ন অঞ্চলে খনগান এবং অঞ্চল-বিশেষে আলকাপ গান প্রচলিত। তবে মালদহের সর্বাধিক প্রচলিত এবং জনপ্রিয় লোকনাট্য হ'ল 'গম্ভীরা গান'। উল্লিখিত গীতিধারাগুলির একটিও কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের কাছে পরিচিত নয়। এইভাবে সংস্কৃতির দিক থেকেও কোচবিহার এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা দুই বিপরীত প্রান্তবর্তী দুটি অঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে।

প্রসংগত রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কথাও উল্লেখ করার মত। রাজবংশী সমাজ সাধারণতঃ নিকটবর্তী স্থানেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অভ্যস্ত। দূরবর্তী স্থানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে এই সমাজের অনাগ্রহ বিগত শতকের শেষ পাদেও দূর হয়নি। ফলে এই সূত্রে এক অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং আদান প্রদানের যে সুযোগ থাকে তা এই সমাজ ব্যবহার করতে পারেনি।

এইভাবে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে কোচবিহার এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে কোনো ঐক্য গড়ে ওঠেনি। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী সমাজের মুখের ভাষার মধ্যে মোটামুটি একপ্রকারের সাদৃশ্যতা থাকলেও সম্পূর্ণ সাযুজ্যতা বা সামঞ্জস্য কোনো সময়েই গড়ে ওঠেনি।

কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার অধিবাসী রাজবংশীদের [illegible] ভাষার পার্থক্যের মূলে আরও কিছু কারণ নিহিত থাকতে পারে বলে আমরা অনুমান করি। দার্জিলিং জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ নেপাল ও বিহার সীমান্তের সন্নিকটবর্তী হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষায় নেপালী এবং হিন্দীভাষীদের প্রভাব পড়ে থাকা বিচিত্র নয়। অনুরূপভাবে মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কিছু অঞ্চল বিহার সীমান্তের নিকটবর্তী। ফলে সীমান্ত সন্নিহিত ঐসব অঞ্চলের ভাষায় হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষার প্রভাব পড়েছে, এমন অনুমান অসংগত নাও হতে পারে। অন্যদিকে কোচবিহার জেলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম এই চারটি [illegible] সীমান্তই মোটামুটিভাবে রাজবংশী ভাষাভাষী অঞ্চল দ্বারা পরিবৃত।

কোচবিহারে সাঁওতাল এবং অন্যান্য অরাজবংশীভাষী জনসংখ্যা অন্য চারটি জেলা অপেক্ষা কম। উপরন্তু জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার চা বাগানগুলিতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করে তাদের একটি

অংশ ঐ অঞ্চলের আদিবাসী এবং অন্য অংশটি বহিরাগত। বহিরাগতদের মধ্যে অধিকাংশেরই সাধারণ যোগাযোগের ভাষা হিন্দী। এই চা শ্রমিক এবং রাজবংশী, এই দুটি জনগোষ্ঠীই সন্নিহিত অঞ্চলের হাট বাজারগুলি থেকে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে এবং তদুপলক্ষে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। সামাজিক জীবনেও এই দুটি জনগোষ্ঠীর লোকেরা ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিকটবর্তী হতে চলেছে। এইভাবে সন্নিহিত বসবাসের ফলে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের অধিবাসী রাজবংশীরা যে পরিমাণে অন্য ভাষাভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসেছে কোচবিহার জেলার রাজবংশীরা সেই পরিমাণে আসতে পারেনি। ফলতঃ প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলির ভাষায় কিছু পরিমাণে ভিন্ন ভাষার উপাদান প্রবেশ করেছে। কোচবিহারের ভাষায় তা করেনি। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের ভাষার এই স্বাতন্ত্র্য গ্রিয়ার্সনের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে। কোচবিহারের রাজবংশীদের ভাষার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যময় এই অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষাকে তিনি যে একটি 'স্বতন্ত্র'সাব ডায়লেক্ট' বলে চিহ্নিত করেছেন একথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত সমস্ত কারণে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশীদের মুখের ভাষায় কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। এই আঞ্চলিক বিভিন্নতার ভিত্তিতে সমগ্র রাজবংশী বাচক-গোষ্ঠীকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে। এর একটি ভাগে পড়ে কোচবিহারের মাথাভাঙা, দিনহাটা এবং কোচবিহার সদর মহকুমার রাজবংশীরা। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার দক্ষিণ-পূর্বাংশ সহ ফালাকাটা থানার কিছু অংশের রাজবংশীদের ভাষার সঙ্গে কোচবিহারের পূর্বোল্লিখিত অঞ্চল-সমূহের ভাষার সাদৃশ্য আছে। এ কারণে এই সব অঞ্চলের রাজবংশীদেরও এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এছাড়া কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জ মহকুমার পূর্বাংশের রাজবংশীরা ভাষা-সাদৃশ্যের কারণে এই ভাগটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উল্লিখিত অঞ্চলগুলি ছাড়া কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার বাকী অংশগুলি সমেত সমগ্র দার্জিলিং জেলা, মালদা এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অধিবাসী রাজবংশীদের আমরা আর একটি ভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই ধরণের বিভাজন করতে গিয়ে প্রতিটি জেলার প্রতিটি থানার অন্তর্গত প্রতিটি অঞ্চলে আমরা সমীক্ষা চালিয়েছি। প্রয়োজন বোধে কোনো কোনো স্থানে একাধিকবার গিয়েছি এবং এইভাবে নিঃসংশয়িত হওয়ার পরে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এর মধ্যে হলদিবাড়ি থানা কোচবিহারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোচবিহারের সঙ্গে তার ভাষাগত সাদৃশ্য না থাকার কারণ হ'ল এই যে এই থানাটি কার্যতঃ জলপাইগুড়ি জেলারই মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলমাত্র। কারণ এই থানার উত্তর-পূর্বদিক দিয়ে তিস্তা নদী প্রবাহিত হয়ে এই অঞ্চলটিকে কোচবিহার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তাই রেলপথে বা যানবাহন চলার উপযোগী স্থলপথে হলদিবাড়িতে যেতে হলে জলপাইগুড়ির ভিতর দিয়েই

যেতে হয়। ফলতঃ হলদিবাড়ির সাংস্কৃতিক লেনদেন কোচবিহার অপেক্ষা সন্নিহিত অঞ্চল জলপাইগুড়ির সঙ্গেই বেশী পরিমাণে সংঘটিত হয়। আইন-আদালত, মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজে অবশ্য হলদিবাড়ির অধিবাসীদের কোচবিহারে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত কাজে তাদের মূলতঃ কোচবিহার সহরপর্যন্তই যেতে হয়। সহরের বাইরে গ্রামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই যাতায়াত ভাষাগত সংযোগের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে না। ফলে কোচবিহারের সঙ্গে নয়, হলদি-বাড়ির ভাষাগত সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে জলপাইগুড়ির সঙ্গে।

কোচবিহার জেলার মধ্যেও একাধিক কারণে ভাষাগত কিছু আঞ্চলিক বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তুফানগঞ্জ এবং দিনহাটা মহকুমার পূর্বাংশ আসামের গোয়ালপাড়া সীমান্তের সন্নিকটবর্তী হওয়ার ফলে কিছু অসমীয়া শব্দ, যা গোয়ালপাড়ার রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত, উল্লিখিত অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষাতেও ঢুকে পড়েছে। এই ধরণের একটি শব্দ হল 'জুই'। এর অর্থ আগুন। গোয়ালপাড়ার রাজবংশী এবং পূর্ব আসামের অধিবাসীদের মধ্যে আগুনের প্রতিশব্দ হিসেবে এই শব্দটি প্রচলিত। অনুরূপ আর একটি শব্দ হ'ল 'তচলা'। এর অর্থ কড়াই। এইভাবে অসমীয়া শব্দের ব্যবহার ছাড়াও উল্লিখিত অঞ্চলগুলির ভাষায় কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন উত্তম পুরুষের বহুবচনে প্রথমা বিভক্তিতে কোচবিহারের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে 'হামরা', 'হামা' ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয় সেখানে উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে 'আমরা', 'আমরালা', 'আমরাগুলা' ইত্যাদি সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়।

কোচবিহারকে প্রায় সমানভাবে দুভাগে বিভক্ত করে এই জেলার মধ্য দিয়ে জলঢাকা নদী প্রবাহিত। নিম্ন গতিতে এই নদীর নামই স্থানবিশেষে 'জদোকা', 'মানসাই' ইত্যাদি। এই নদীর জলধারা বিশ শতকের শেষভাগেও রাজবংশীর মত একটি অনুন্নত সমাজের লোকদের কাছে দুরতিক্রম্য একটি বাধা হিসেবে পরিগণিত। সম্প্রতি এই নদীর উপরে দুটি জায়গায় সেতু তৈরী হওয়ার ফলে এই নদী এর দুই তীরবর্তী অধিবাসীদের কাছে আর কোনো বাধাই নয়। কিন্তু সেতু তৈরীর আগে পর্যন্ত এই নদীই কোচ-বিহারের পূর্বাংশ এবং পশ্চিমাংশের মধ্যে ব্যবধান তৈরী করে রেখেছিল। একারণে পূর্বকোচবিহার এবং পশ্চিমকোচবিহারের মধ্যে ভাষাগত কিছু পার্থক্যসূত্র গড়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে তিস্তা নদী প্রবাহিত হওয়ার ফলে এই নদীর দুই তীরের রাজবংশীদের মুখের ভাষায় কিছু পরস্পরবিরোধে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্ম নিয়েছে। ভাষাগত এই বিভিন্নতার দিকে লক্ষ রেখেই সম্ভবতঃ তিস্তার পূর্বতীরের রাজবংশীরা পশ্চিম তীরের রাজবংশীদের ভাষাকে 'পারাপারিয়া ভাষা' এবং পশ্চিম তীরের রাজবংশীরা পূর্বতীরের রাজবংশীদের ভাষাকে 'আগাপারিয়া ভাষা' বলে থাকে। এই আগাপারিয়া ও পারাপারিয়া ভাষার মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর এ নিয়ে দুই তীরের অধিবাসীদের মধ্যে নানা

সময়ে হাস্য পরিহাস, 'ছিলকাভাঙা'* ইত্যাদি হয়ে থাকে। একইভাবে দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদা জেলার রাজবংশীদের মধ্যেও ভাষার দিক থেকে প্রচুর আঞ্চলিক বৈচিত্র্য রয়েছে। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক বিভিন্নতার ভিত্তিতে ভাগ করতে হলে উত্তরবঙ্গকে বহুভাগে ভাগ বিভক্ত করতে হয়। এই বিভাজনের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনাও করা সম্ভব। গৃহীত প্রকল্পটির পরিসরের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা উল্লিখিত প্রকারের বিভাজন থেকে বিরত থেকেছি, এবং প্রধান প্রধান স্বাতন্ত্র্য-সূচক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রকল্পভুক্ত অঞ্চলটিকে দুটি মুখ্য ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে ভাগ করেছি।

উল্লেখের সুবিধার্থে এখন থেকে অঞ্চলদুটিকে যথাক্রমে 'কোচবিহার' এবং 'অন্যান্য অঞ্চল' বলে উল্লেখ করা হবে। আমাদের সমীক্ষায় এই দুটি অঞ্চলের ভাষার মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক

(১) শব্দের মধ্য এবং অন্ত্য অবস্থানে /ল/-এর উচ্চারণ থাকলেও কোচবিহারের রাজবংশীদের আদ্যাবস্থানে /ল/-এর উচ্চারণ নেই। শিষ্ট বাংলার মতো সমরূপবিশিষ্ট শব্দে এই জাতীয় ধ্বনিপরিবেশে এক্ষেত্রে /ল/-এর পরিবর্তে /ন/ উচ্চারিত হয়। যেমন-

শিষ্ট বাংলা	রাজবংশী	
ললিত	নলিত	
লাল	নাল	
লজ্জা	নইজ্জা	ইত্যাদি।

কিন্তু কোচবিহার ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতীয় ধ্বনিপরিবেশে /ল/-এর উচ্চারণ প্রচলিত। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
নাজ্	লাজ্	'লজ্জা'	
নিগাইম্	লেগাম্	'দিয়ে যাব'	ইত্যাদি।

(২) কোচবিহারে অন্যান্য অবস্থানে /র/-এর উচ্চারণ থাকলেও আদ্যাবস্থানে নেই। যেমন-

মূল শব্দ	রাজবংশী
রক্ত	অকতো
রস	অস্
রাজা	আজা ইত্যাদি।

---

* উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রবাদ উদ্ধৃত করে বক্রোক্তি করার একটি রীতি মহিলাদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। এই রীতি বা কৌশলকে বলা হয় 'ছিলকাভাঙা'।

কিন্তু কোচবিহার ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অঞ্চলে আদ্যব্যঞ্জন হিসেবে /র/-এর ব্যবহার আছে। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
অ	রখ	'থাকা'
উই	রুহি	'রুই মাছ'
অঙিনা	রঙিনা	'রঙিন' ইত্যাদি।

(৩) দ্রুততার প্রবণতার জন্য রাজবংশীতে দুই-এর অধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি বিলুপ্ত হয়ে তা দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে পরিণত হয়। কোচবিহারের তুলনায় অন্যান্য অঞ্চলে অক্ষরসংকোচের এই প্রবণতা অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
এইপাকে	এইপকে	'এই দিকে'
ঐপাকে	ঐপকে	'ঐ দিকে'
সেপাকে	সেপকে, থিপকে	'এই দিকে' ইত্যাদি।

(৪) মধ্যবর্তী স্বরধ্বনির বিলোপের মাধ্যমে দুই-এর অধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে রূপান্তর ছাড়াও শব্দের অন্ত্যস্বরের অন্য স্বরধ্বনিতে রূপান্তর এবং তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির বিলোপের মাধ্যমেও অন্যান্য অঞ্চলে দুই-এর অধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে পরিণত হয়। কোচবিহারে এই জাতীয় ধ্বনিপরিবর্তন এবং বিলোপের ঘটনা বিরলদৃষ্ট। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
থিপকুরি	থিপকা	'তাড়াতাড়ি'
অ্যাঙকুরি	অ্যাঙকা	'এইভাবে'
ক্যাঙকুরি	ক্যাঙকা	'কেমন করে'
জ্যাঙকুরি	জ্যাঙকা	'যেভাবে' ইত্যাদি।

(৫) শব্দের আদিতে কোচবিহারের মধ্যোচ্চ পশ্চাৎ স্বর /ও/ থাকলে তা অন্যান্য অঞ্চলে মধ্যনিম্ন পশ্চাৎ স্বর /অ/-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
বোকা	বকা	'নির্বোধ'
পোকা	পকা	'পোকা'
ওগ্‌লা	অগ্‌লা	'উদ্গীরণ করা'
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
ঢোকট্টা	ধকট্টা	'দাঁত দিয়ে কাটা'
ওছা	অছা	'বিছানো'
ওসার্	অসার্	'প্রশস্ত, পরিসর'
দোতা	দতা	'মোটা দড়ি'
ঢোপা	ধপা	'থোপা'
জোতা	জতা	'জুতা'
ওঠা	অঠা	'ওঠা, ওঠানো'
দোলা	দহলা	'নীচু জমি'
জোন্	জন্	'জন' [illegible]
নোটা	নটা	'লোটা' ইত্যাদি।

(৬) কোচবিহারে ব্যবহৃত কিছু শব্দের আদ্যস্বরধ্বনি /আ/ অন্যান্য অঞ্চলে /অ/-তে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
আলুস্	অলুস্	'আলুস'
আদোন্	অদোন্	'অগ্রহায়ণ ধান'
আচম্বিত্	অচম্বিত্	'হঠাৎ'
আচানোক্	অচানোক্	'আশ্চর্যজনক'
কাটোল্	কটোয়াল্	'কাঠাল' ইত্যাদি।

(৭) কিছু কিছু শব্দের আদ্যস্বর কোচবিহারে যেখানে উচ্চ ও পশ্চাৎ অন্যান্য অঞ্চলে তা মধ্যোচ্চ পশ্চাৎ স্বরে পরিণত হয়। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
হুকা	হোকা	'হুঁকা'
জুতা	জোতা	'জুতা'
মুজা	মোজা	'মোজা' ইত্যাদি।

(৮) কোচবিহারে পরাগত স্বরসঙ্গতির সংঘটন বিপুল পরিমাণে দেখা যায়। অন্যান্য অঞ্চলে এই [illegible] জাতীয় ধ্বনিপরিবেশে এই ধরনের স্বরসঙ্গতির উদাহরণ দুর্লভ। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
দেখুছুং	দেখিছু	'দেখেছি'

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
দেখুলুঙ্	দেখিনু	'দেখলাম'
দেখুছুলুঙ্	দেখিছিনু	'দেখেছিলাম'
দেখুরু	দেখিলো	'দেখলে, দেখলি'
দেখুবু	দেখিবো	'দেখবে, দেখবি'
বোশুলুঙ্	বশিনু	'বসলাম'
লেখুলুঙ্	লেখিনু	'লিখলাম'
খুজুলুঙ্	খুজিনু	'খুঁজ করলাম'
পুছুলুঙ্	পুছিনু	'জিজ্ঞাসা করলাম'
পুছুরু	পুছিলো	'জিজ্ঞাসা করলে, করলি' ইত্যাদি।

(৯) কোচবিহারে ব্যবহৃত শব্দমধ্যস্থ কতিপয় অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি জলপাইগুড়ি এবং অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন হিসেবে উচ্চারিত হয়। কোচবিহারের অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের এই জাতীয় মহাপ্রাণতা ঘটে না। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
কাটি	কাঠি	'কাঠি'
আগুন্	অঘুন্	'আগুন'
আগোন্	অঘোন্	'অগ্রহায়ণ মাস'
এইটে	এইঠে	'এখানে'
ওইটে	ওইঠে	'ওখানে'
আটিয়া	আঠিয়া	'আঁটি ওয়ালা'
মাটেরা	মাঠেরা	'দুর্বল'
নাটি	নাঠি	'লাঠি'
জাটি	জাঠি	'দেবতা'
গাটি	গাঠি	'গাঁটি'
বাদার্	বাধার্	'অপদার্থ'
কাটোল্	কঠোয়াল্	'কাঁঠাল'
বটুয়া	বঠুয়া	'এক প্রকার মাছ'
নিটুয়া	নিঠুয়া	'জনহীন' ইত্যাদি।

(১০) মহাপ্রাণতার দিকে ঝোঁক থাকার ফলে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তরের পরিবর্তে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে কখনো কখনো সেই ব্যঞ্জনের বা স্বরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্থানে একটি /হ/ ধ্বনির আগম ঘটে। এই জাতীয় রূপান্তর বা আগমের ঘটনা কোচবিহারের উচ্চারণে লক্ষ করা যায় না। যেমন–

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
উমা	অম্‌হা	'তারা, তিনি'
তোমা	তোম্‌হা	'তোমরা, আপনি, আপনারা'
উমার্	অম্‌হার্	'তাদের, তাঁর, তাঁদের'
তোমার	তোম্‌হার্	'তোমদের, আপনার, আপনাদের'
দোলা	দহলা	'নীচু জমি'
দোতা	দহতা	'মোটা দড়ি'
বইন্	বহিন্	'বোন'
ঘই	ঘহি	'রেখা'
বায়রা	বাহেরা	'বাহির'
গাইন্	গাহিন্	'উদুখল দন্ড'
গোম্	গোহোম্	'গম'
পইলা	পহিলা	'প্রথম'
পই	পহি	'খুঁটি'
বয়রা	বহেরা, বহিরা	'কালা(পুং)'
বইরি	বহিরি	'কালা(স্ত্রী)'
খোয়ারি	খোহারি	'প্রস্তুতি, প্রাতকালীন'
গোয়ালি	গোহালি	'গোয়াল'
দই	দহি	'দই'
ইমা	হিমা	'এরা, এঁরা'
উমা	হুমা	'তারা, তিনি, তাঁরা'
জোয়ারি	জোহারি	'বাঁশের তৈরী দরজা'
খোয়াল্	খোহাল্	'বিচুলি' ইত্যাদি।

(১৬) কোচবিহারে ব্যবহৃত কিছু শব্দের মধ্যবর্তী নাসিক্য ব্যঞ্জন মহাপ্রাণতার দিকে ঝোঁক থাকার ফলে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। যেমন-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
আমকা	আহোকা	'হঠাৎ'
পঙার্	পহার্	'সাঁতার'
টুঙি	টুহি	'[illegible] ঘরের শীর্ষস্থান'
বামোন্	বাহোন্	'ব্রাহ্মণ'
সিঙানি	সিহানি	'কফ'
ফিঙরা	ফিহিরা	'ফুলে ওঠা' ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক

(১) কারক ও বিভক্তির ক্ষেত্রে :-

কারক ও বিভক্তির ক্ষেত্রে কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। কেবল কোচবিহারে যেখানে তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন 'দিয়া' অন্যান্য অঞ্চলে সেখানে তা 'দি'। বলাই বাহুল্য সংক্ষিপ্তকরণ প্রবণতার জন্যই এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্নও কোচবিহারের তুলনায় অন্যান্য অঞ্চলে কিছুটা স্বতন্ত্র। কোচবিহারে পঞ্চমী বিভক্তি নিষ্পন্ন হয়'[illegible]' 'ঠৈ-থাকি'যোগে। অন্যান্য অঞ্চলে তা নিষ্পন্ন হয়'ঠে-তকা'যোগে। সপ্তমী বিভক্তিতেও কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। এক্ষেত্রে কোচবিহারে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন 'ঠৈ'এবং অন্যান্য অঞ্চলে 'ঠে'। দুটি বিভক্তির ক্ষেত্রে এই ধরণের পার্থক্যের মূলে রয়েছে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে -র মহাপ্রাণতা। এছাড়া কারক বিভক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য দুটি অঞ্চলের মধ্যে নেই। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
তৃতীয়া	মোক্ দিয়া	মোক্দি	'আমাকে দিয়ে'
পঞ্চমী	মোর্ঠৈ থাকি	মোর্ঠে তকা	'আমার কাছ থেকে'
সপ্তমী	মোর্ঠৈ	মোর্ঠে	'আমার কাছে' ইত্যাদি।

সর্বনাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও দুটি অঞ্চলের মধ্যে বিভক্তির এই ধরণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

(২) ক্রিয়ার রূপঃ-

সাধারণ বর্তমান

সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার রূপে কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের পার্থক্য ঘটে থাকে মূলতঃ উত্তম পুরুষের একবচনের ক্ষেত্রে। উত্তম পুরুষের বহুবচন, মধ্যম এবং প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য ঘটে না। উদাহরণ-

স্বরান্ত ধাতুতে

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
খাঙ্	খাও	'খাই'	
যাঙ্	যাও	'যাই'	ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
দ্যাখ্যাঙ্	দ্যাখো	'দেখি'	
বোলোঙ্	বোলো	'বলি'	
ন্যাখোঙ্	ন্যাখো	'লিখি'	ইত্যাদি।

ঘটমান বর্তমান

ঘটমান বর্তমান কালে ক্রিয়ার রূপ গঠনে কোচবিহারে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে 'বার' এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে 'ইব' এবং 'আর'-এর সংমিশ্রণে উদ্ভূত 'ইবার' প্রত্যয় যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার গঠনে সম্পূর্ণতা আনার জন্য অতঃপর সহায়ক ক্রিয়া হিসেবে 'ধর্' অথবা 'লাগ' যুক্ত হয়, এবং সবশেষে কাল-জ্ঞাপক বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার গঠনে সম্পূর্ণতা আনে। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে সহায়ক ক্রিয়ার সাহায্য ছাড়াই ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। যেক্ষেত্রে সহায়ক ক্রিয়া যোগে ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়ার রূপ গঠন করা হয় সেক্ষেত্রেও ধাতুর উত্তরে যুক্ত প্রত্যয়টির রূপ কিছু ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কোচবিহারে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত 'বার' এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত 'ইবার' অন্যান্য অঞ্চলে যথাক্রমে 'বা' এবং 'ইবা'-তে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ-

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খাবার্ ধচ্চুঙ্	খাচু	'খাচ্ছি'	
মধ্যম	খাবার্ ধচ্চিস্	খাচিস্	'খাচ্ছো, খাচ্ছিস'	
প্রথম	খাবার্ ধইচ্চে	খাচে	'খাচ্ছে'	ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	দেখিবার্ ধচ্চুঙ্	দ্যাখেছু	'দেখছি'	
মধ্যম	দেখিবার্ ধচ্চিস্	দ্যাখেছিত্	'দেখছো, দেখছিস'	
প্রথম	দেখিবার্ ধইচ্চে	দ্যাখেছে	'দেখছে'	ইত্যাদি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সহায়ক ক্রিয়া যোগে ঘটমান বর্তমান কালের রূপ গঠনের দৃষ্টান্ত কোচবিহার ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলেও পাওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে মূল ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত প্রত্যয়গুলি একটু পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে এই জাতীয় ক্রিয়াপদের গঠনে কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে সহায়ক ক্রিয়া হিসেবে 'ধর' এবং 'লাগ' এই দুটি ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও মূলতঃ 'লাগ' ধাতুটি ব্যবহারের প্রবণতাই সমধিক। এই ধাতুটির রূপভেদের ক্ষেত্রেও কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। উদাহরণ–

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খাবার্ ধচ্চুঙ্	খাবা লাগচু	'খাচ্ছি'	
মধ্যম	খাবার্ ধচ্চিস্	খাবা লাগ্ছিত্	'খাচ্ছো, খাচ্ছিস'	
প্রথম	খাবার্ ধইচ্চে	খাবা লাইগছে	'খাচ্ছে'	ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	দেখিবার্ ধচ্চুঙ্	দেখিবা লাগচু	'দেখছি'	
মধ্যম	দেখিবার্ ধচ্চিস্	দেখিবা লাগ্ছিত্	'দেখছিস, দেখছো'	
প্রথম	দেখিবার্ ধইচ্চে	দেখিবা লাইগছে	'দেখছে'	ইত্যাদি।

উল্লিখিত রীতি ছাড়াও দার্জিলিং-এর কিছু অঞ্চলে, পশ্চিম দিনাজপুরে এবং মালদায় ক্রিয়াপদের ঘটমান বর্তমানের রূপ গঠনে স্বতন্ত্র একটি রীতি অনুসৃত হয়। এই স্বাতন্ত্র্য কেবল ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ–

	একবচন	বহুবচন		
উত্তম	করোছো	করোছি	'করছি'	
মধ্যম	করোছিত্	করোছেন্	'করছো'	
প্রথম	করোছে	করোছে	'করছে'	ইত্যাদি।

পুরাঘটিত বর্তমান

পুরাঘটিত বর্তমান কালে ক্রিয়ার রূপ গঠনে কোচবিহারের মূল ধাতু স্বরান্ত হলে তার উত্তরে উত্তম পুরুষের একবচনে 'ছুঙ্', বহুবচনে 'ছি', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ছিস্', বহুবচনে 'ইছেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইছে' বিভক্তি যুক্ত হয়। অন্যান্য অঞ্চলে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'ছু', 'ছি', 'ছিত্', 'ইছেন্', এবং 'ইছে'। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে যুক্ত বিভক্তি গুলি এক্ষেত্রে কোচবিহারে উত্তম পুরুষের একবচনে 'উছুঙ্', বহুবচনে 'ইছি', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ইছিস্', বহুবচনে 'ইছেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইছে'। অন্যান্য অঞ্চলে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'ইছু', 'ইছি', 'ইছিত্', 'ইছেন্', এবং 'ইছে'। উদাহরণ-

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খাছুঙ্	খাছু	'খেয়েছি'	
মধ্যম	খাছিস্	খাছিত্	'খেয়েছিস'	
প্রথম	খাইছে	খাইছে	'খেয়েছে'	ইত্যাদি

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	দেখুছুঙ্	দেখিছু	'দেখেছি'	
মধ্যম	দেখিছিস্	দেখিছিত্	'দেখেছিস'	
প্রথম	দেখিছে	দেখিছে	'দেখেছে'	ইত্যাদি

সাধারণ অতীত

সাধারণ অতীত কালে কোচবিহারে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে উত্তম পুরুষের একবচনে 'লুঙ্', বহুবচনে 'ইলোঙ্', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'লু', বহুবচনে 'ইলেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইল্' বিভক্তি যুক্ত হয়। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত এই বিভক্তিগুলি হ'ল যথাক্রমে 'উলুঙ্', 'ইলোঙ্', 'উলু', 'ইলেন্' এবং [illegible] 'ইল্'। অন্যান্য অঞ্চলে এক্ষেত্রে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত বিভক্তিগুলি হ'ল উত্তম পুরুষের একবচনে 'নু', বহুবচনে 'ইনো, মধ্যম পুরুষের একবচনে 'লো', বহুবচনে 'ইলেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইল্'। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর ক্ষেত্রে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'নু', 'ইনো', 'ইলো', 'ইলেন্' এবং 'ইল্'। উদাহরণ-

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খালুঙ্	খানু	'খেলাম'	
মধ্যম	খালু	খালো	'খেলে, খেলি'	
প্রথম	খাইল্	খাইল্	'খেল'	ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	করুলুঙ্	করনু	'করলাম'	
মধ্যম	করুলু	করিলো	'করলে, করলি'	
প্রথম	করিল্	করিল্	'করল'	ইত্যাদি।

পুরাঘটিত অতীত

পুরাঘটিত অতীতে ক্রিয়ার রূপ গঠনে কোচবিহারে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে উত্তম পুরুষের একবচনে 'ছুলুঙ্', বহুবচনে 'ছিলোঙ্', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ছুলু', বহুবচনে 'ছিলেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইছেলো' বিভক্তি যুক্ত হয়। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'উছুলুঙ্', 'ইছিলোঙ্', 'উছুলু', 'ইছিলেন্' এবং 'ইছেলো'। অন্যান্য অঞ্চলে পুরাঘটিত অতীতের ক্রিয়ার রূপে প্রযোজ্য বিভক্তিগুলি হ'ল উত্তম পুরুষের একবচনে 'ছিনু', বহুবচনে 'ছিনো', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ছিলো', বহুবচনে 'ছিলেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'ইছেলো'। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে প্রযোজ্য বিভক্তিগুলি এক্ষেত্রে যথাক্রমে 'ইছিনু', 'ইছিনো', 'ইছিলো', 'ইছিলেন্' এবং 'ইছেলো'। উদাহরণ—

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খাছুলুঙ্	খাছিনু	'খেয়েছিলাম'	
মধ্যম	খাছুলু	খাছিলো	'খেয়েছিলে'	
প্রথম	খাইছেলো	খাইছেলো	'খেয়েছিল'	ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
উত্তম	করুছুলুঙ্	করিছিনু	'করেছিলাম'

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
মধ্যম	করুরুন্	করিছিলো	'করেছিলে'	
প্রথম	করিছেলো	করিছেলো	'করেছিল'	ইত্যাদি।

সাধারণ ভবিষ্যত

কোচবিহারে সাধারণ ভবিষ্যত কালে ক্রিয়ার রূপ গঠনে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে যুক্ত বিভক্তিগুলি হল উত্তম পুরুষের একবচনে 'ইম্', বহুবচনে 'ইমো', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'বু', বহুবচনে 'বেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে 'বে'। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে এই বিভক্তিগুলি যথাক্রমে 'ইম্', 'ইমো', 'উবু', 'ইবেন্' এবং 'ইবে'। অন্যান্য অঞ্চলে স্বরান্ত ধাতুর উত্তরে এক্ষেত্রে উত্তম পুরুষের একবচনে 'ম', বহুবচনে 'মো', মধ্যম পুরুষের একবচনে 'বো', বহুবচনে 'বেন্' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে এবং বহুবচনে 'বে' বিভক্তি যুক্ত হয়। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরে বিভক্তি সমূহ এক্ষেত্রে যথাক্রমে 'ইম্', 'ইমো', 'ইবো', 'ইবেন্' এবং 'ইবে'। উদাহরণ—

স্বরান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	খাইম্	খাম্	'খাব'	
মধ্যম	খাবু	খাবো	'খাবে'	
প্রথম	খাবে	খাবে	'খাবে'	ইত্যাদি

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে

	কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
উত্তম	করিম্	করিম্	'করব'	
মধ্যম	করুবু	করিবো	'করবে'	
প্রথম	করিবে	করিবে	'করবে'	ইত্যাদি

নামর্থ বা পূর্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়া

কোচবিহারে নামর্থ বা পূর্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয় ক্রিয়ার নির্দেশক ভাবের সঙ্গে 'ই', 'ইয়া', 'এ', 'এয়া' ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে। অন্যান্য অঞ্চলে এই প্রত্যয়গুলি ঈষৎ ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণ—

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
করি/করিয়া	করি/করে/করিয়া	'করে'	
পরে/পরেয়া	পরে/পরেয়া/পরায়	'পড়িয়ে'	ইত্যাদি

তুমর্থ বা উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া

কোচবিহারে মূল ধাতু স্বরান্ত হলে তার উত্তরে 'বার্' এবং ব্যঞ্জনান্ত হলে তার উত্তরে 'ইবার্' প্রত্যয় যোগ করে তুমর্থ বা উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন সম্পন্ন হয়। অন্যান্য অঞ্চলে এই প্রত্যয়দুটি যথাক্রমে 'বা' এবং 'ইবা'। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
কবার্	কবা, কহিবা	'বলতে'
খাবার্	খাবা	'খেতে'
জাবার্	জাবা, জাতা	'যেতে'
করিবার্	করিবা	'করতে' ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও উল্লিখিত প্রত্যয়গুলি তুমর্থ অসমাপিকার ভাব প্রকাশ করলেও কখনো কখনো কিছু অনুসর্গ এগুলির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এই অনুসর্গগুলি হ'ল 'বাদে', 'তানে', 'ঘইন্চুন', 'নাগি' ইত্যাদি। এর মধ্যে 'বাদে', 'ঘইন্চুন' এবং 'নাগি' বিশেষভাবে কোচবিহারেই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 'তানে' অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবহারে 'বাদে', 'ঘইন্চুন' এবং 'নাগি' অপেক্ষা গুরুত্ব পায়। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল		
খাবার্বাদে	খাবা তানে	'খেতে'	
কবার্বাদে	কভা তানে	'বলতে'	
করিবার্ঘইন্চুন	করিবা তানে	'করতে'	
জাবার্নাগি	জাতা তানে	'যেতে'	ইত্যাদি।

(৩) ধাতুর রূপেঃ-

অন্ত্যব্যঞ্জন /হ/ লুপ্ত হওয়ার ফলে যে সমস্ত ব্যঞ্জনান্ত ধাতু বাংলায় স্বরান্ত ধাতুতে রূপান্তরিত হয়েছে সেগুলি কোচবিহারে স্বরান্ত ধাতু হিসেবেই প্রচলিত। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে এই ধাতুগুলির অন্ত্যব্যঞ্জন /হ/ বজায় থাকে। ফলতঃ এই ধাতুগুলি উল্লিখিত অঞ্চল সমূহে ব্যঞ্জনান্ত। উদাহরণ-

মূল রূপ	কোচবিহারে প্রচলিত রূপ	অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত রূপ	
√বহ্	√ব	√বহ্	'বহন করা'
√রহ্	√র	√রহ্	'থাকা'
√কহ্	√ক	√কহ্	'বলা'
√সহ্	√স	√সহ্	'সহা করা' ইত্যাদি।

(৪) সর্বনামের রূপে :–

কোচবিহার এবং অন্যান্য অঞ্চলের সর্বনামগুলি মূলতঃ একই মূল উৎস থেকে উদ্ভূত। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি অঞ্চলের মধ্যে সর্বনামের রূপগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য প্রধানতঃ পরিলক্ষিত হয় মধ্যম পুরুষের বহুবচনে, প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনে, এবং নিকট নির্দেশকপুরুষ বাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে। উদাহরণ–

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
তোমরা	তমহা, তোমহা	'তোমরা'
উয়ায়	অয়	'সে'
উমরা	অমহা, সুধা	'তারা'
ইয়ায়	আয়	'এই ব্যক্তি'
ইমা, ইমরা	আমহা, হিমা	'এরা' ইত্যাদি।

(৫) ক্রিয়া বিশেষণের রূপে :–

কোচবিহারে ব্যবহৃত ক্রিয়া বিশেষণের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবহৃত ক্রিয়া বিশেষণের পার্থক্য নিম্নরূপ।

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
অ্যাংকুরি	অ্যাংকুরা	'এই ভাবে'
হ্যাংকুরি	হ্যাংকুরা	'এইভাবে'
ক্যাংকুরি	ক্যাংকুরা	'কিভাবে'
ঝিলকুরি	ঝিলকুরা	'দ্রুত বেগে, তাড়াতাড়ি'
ধড়কুরি	ধড়কুরা	'তাড়াতাড়ি'
খমকুরি	খমকুরা	'তাড়াতাড়ি, হঠাৎ'
এইপাকে	এইপকে	'এদিকে'
সেপাকে	সিপকে	'সে দিকে'
হেপাকে	হিপকে	'এদিকে'
হোপাকে	হোপকে	'ওদিকে' ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে উচ্চারণের দ্রুততা এবং সংক্ষিপ্তকরণ প্রবণতার জন্যই কোচবিহারের সঙ্গে ক্রিয়া-বিশেষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের উল্লিখিত প্রকারের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। রূপের দিক থেকে এই ধরণের পার্থক্য থাকলেও ক্রিয়া বিশেষণগুলি উভয় অঞ্চলেই মূলতঃ একই উৎসজাত।

(৬) বহুবচন সূচক প্রত্যয়ের রূপে ঃ-

কোচবিহারে বহুবচন সূচক প্রত্যয় হিসেবে 'লা', 'গিলা' এবং 'ঘর্'-এর ব্যবহারই সর্বাধিক। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে এই প্রত্যয়গুলি যথাক্রমে 'লা', 'গুলা' এবং 'ঘ'। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
মানষিলা	মানষিলা	'মানুষগুলি'
মানষি গিলা	মানষি গুলা	'মানুষগুলি'
ঠাকুরের্ঘর্	ঠাকুরের্ঘ	'ঠাকুরেরা'
ছাওয়ার্ঘর্	ছাওয়ার্ঘ	'ছেলেরা' ইত্যাদি।

(৭) সংযোগমূলক ক্রিয়ার রূপে ঃ-

সংযোগমূলক ক্রিয়ার রূপ গঠনের ক্ষেত্রে কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
করিবার্ নাগিবে	করিবা হবে	'করতে হবে'
যাবার্ নাগিবে	যাবা হবে	'যেতে হবে'
যাওয়া নাগে	যাবা নাগে	'যেতে হয়'
করিবার্ নাগিল্	করিবা হইল্	'যেতে হ'ল'
বুঝিবার্ নাগে	বুঝিবা নাগে	'বুঝতে হয় ইত্যাদি।

(৮) ধাতুতে ঃ-

অন্যান্য অঞ্চলে কিছু সংখ্যক ক্রিয়া ধাতুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি কোচবিহারে প্রচলিত নয়। এই ধাতুগুলির পরিবর্তে কোচবিহারে অন্য ক্রিয়া ধাতু ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

কোচবিহার	অন্যান্য অঞ্চল	
√থাপা	√নিভা	'নেভানো'
√ভওয়া	√ফুট্	'ফোটা'
√অনুয়া	√বাধা	'বাধানো'
√পুক্	√দেখর্	'দেখ হওয়া'
√ব	√থাক্	'থাকা'
√উঘ্টা	√খাজা	'সন্ধান করা' ইত্যাদি।

শব্দভাণ্ডার

শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে কোচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের পার্থক্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। একই শব্দ, যা কোচবিহারে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে সামান্য পরিমাণে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। একই বিষয় বা বস্তুকে বোঝানোর জন্য দুটি অঞ্চলে পৃথক পৃথক শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বললেই চলে। তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দের অনুপাতও দুটি অঞ্চলে প্রায় সমান।

সম্প্রদায়ভিত্তিক রূপবৈচিত্র্য

রাজবংশী ছাড়াও উত্তরবঙ্গের পলিয়া, দেশী, খ্যান, মুসলমান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আলোচ্য উপভাষাটি ব্যবহার করে এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজবংশী ব্যতিরিক্ত উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই ভাষার কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য আমাদের সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। এক মাত্র মুসলমান সমাজভুক্ত এই ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যখন এই ভাষা ব্যবহার করে তখন তার কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং পারিবারিক সম্পর্কের সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী এই ভাষাভাষী অপরাপর সম্প্রদায়গুলির এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ শব্দাবলী থেকে পৃথক। এছাড়া আরবী এবং ফারসী শব্দের অনুপাতও মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যবহারে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি অপেক্ষা কিছু বেশী। সুতরাং বলা যেতে পারে যে উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজে আলোচ্য উপভাষাটির যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় তা মূলতঃ শব্দগত(Lexical)। এই ধরনের স্বাতন্ত্র্য সমগ্র বঙ্গদেশের বাংলাভাষী মুসলমান সমাজেও লক্ষ্য করা যায়।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কোচবিহারে রাজবংশী জাতির লোকসংখ্যা বেশী। এবং বহুজাতিক ও বহু ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা কোচবিহার অপেক্ষা অন্যান্য অঞ্চলে বেশী। [১৭] তাছাড়া অন্যান্য অঞ্চলগুলি কমবেশী পরিমাণে ভিন্ন ভাষাভাষী এবং অরাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চল দ্বারা পরিবৃত। পক্ষান্তরে কোচবিহার চারদিক থেকেই আলোচ্য উপভাষা ব্যবহারকারী এবং রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত। সমগ্র উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের পর্যালোচনাতেও দেখা গিয়েছে

---

(১৭)সেনসাস রিপোর্ট অব ইণ্ডিয়া, ১৯৬১

যে কোচবিহার ছাড়া উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কোচবিহার এবং তৎসন্নিহিত কতিপয় অঞ্চল সাময়িকভাবে মুসলিম শাসনের আওতায় এসেও দীর্ঘকালীন বিদেশী শাসনের প্রতিষ্ঠা এখানে [illegible] কখনোই সম্ভব হয়নি। এক কথায় ছোট খাটো রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগ ছাড়া কোনো বড় রকমের রাজনৈতিক বিপর্যয় এই অঞ্চলে কখনো সংঘটিত হয়নি। ফলতঃ মোটামুটি ভাবে এক ধরণের রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতাবস্থা এই অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকেই বজায় ছিল। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কোনো বড় রকমের রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের একাধিকবার এই ধরণের রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের আওতায় আসতে হয়েছে।

উপর্যুক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অতঃপর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গত কারণ আছে যে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে আলোচ্য উপভাষাটি বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাতকে ধারণ করে তার মূল রূপ থেকে যে পরিমাণে বিচ্যুত বা বিবর্তিত হয়েছে, কোচবিহারের অপেক্ষাকৃত সুস্থ রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশে সেই পরিমাণে বিচ্যুত বা বিবর্তিত হয়নি। অর্থাৎ [illegible] কোচবিহারের অধিবাসীদের মুখেই এই উপভাষার আদি এবং অকৃত্রিম রূপটি বজায় আছে।

এই যুক্তির ভিত্তিতে, কোচবিহার এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল সমূহে আলোচ্য উপভাষাটির যে রূপ প্রচলিত, বর্তমান আলোচনার জন্য আদর্শ হিসেবে সেই রূপটিকেই গ্রহণ করা হ'ল। এই সিদ্ধান্তের পরিপূরক রূপে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষারূপের সঙ্গে কোচবিহারের ভাষারূপের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনাটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষ অংশে শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলার সঙ্গে কোচবিহারে প্রচলিত আলোচ্য উপভাষাটির একটি তুলনামূলক আলোচনাও যোগ করা হ'ল।

শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলার সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য এবং তুলনামূলক বিচারের বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বর্তমান আলোচনায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের অবকাশ সীমিত। কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে এক্ষেত্রে শিষ্ট বাংলা এবং উত্তর-বঙ্গের উপভাষার মধ্যে বৈসাদৃশ্যের সেই সমস্ত সূত্রের উপরে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হ'ল, যে সমস্ত সূত্র অপেক্ষাকৃত প্রকট। প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে এই বৈসাদৃশ্য আমাদের সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে।

ধ্বনিগত ঃ-

(১) আদ্যব্যঞ্জন হিসেবে /র/ এবং /ল/-এর ব্যবহার উত্তরবঙ্গের উপভাষায় নেই। শিষ্ট বাংলায় এই দুটি ব্যঞ্জনধ্বনিই আদ্যব্যঞ্জন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ-

শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা	
রাম	আম্	
রাজা	আজা	
লাল	নাল্	
লজ্জা	নইজ্জা	ইত্যাদি।

(২) একক মধ্যব্যঞ্জন হিসেবে /ড/-এর ব্যবহার শিষ্ট বাংলায় নেই। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আছে। উদাহরণ- কডোয়া 'শক্ত', গডোয়া 'পুরু, অগভীর', মোডোয়া 'ভ্রুকুটি করা' ইত্যাদি।

(৩) আদিস্বরাগমের দৃষ্টান্ত বাংলার বিভিন্ন উপভাষায় থাকলেও শিষ্ট বাংলায় তা নেই। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আদিস্বরাগম বিপুল পরিমাণে ঘটে থাকে। উদাহরণ-

শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা	
স্পর্ধা	আস্পদ্ধা	
স্পষ্ট	এস্পষ্টো	
স্ত্রী	ইস্তিরি	ইত্যাদি।

(৩) মধ্যস্বরাগম বা স্বরভক্তি শিষ্ট বাংলায় কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু মধ্যস্বরাগমের সাহায্যে শব্দমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জনের বিশ্লেষ ঘটিয়ে উচ্চারণকে সহজ করে নেওয়া উত্তরবঙ্গের উপভাষার একটি নিয়মিত ধ্বনিবৈশিষ্ট্য। উদাহরণ-

শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
যন্ত্র	মন্তুতার্
যন্ত্র	জন্তুতার্
বস্ত্র	বস্তুতার্
বস্ত্র	বস্তুতার্ ইত্যাদি।

(৫) শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন শিষ্ট বাংলায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয় না। এক্ষেত্রে আদিস্বরাগমের সাহায্যে শব্দের আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জনকে বিশ্লিষ্ট করে দেওয়া হয়। উদাহরণ-

শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
স্পর্ধা	আস্পদ্দা
স্থান	এস্থান্
স্নান	এস্নান্ ইত্যাদি।

(৬) ধ্বনির বিবর্তনে শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলা অপিনিহিতির স্তর অতিক্রম করে অভিশ্রুতি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ক্ষেত্রবিশেষে অপিনিহিতি ঘটলেও তা এই উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ধ্বনির বিবর্তনে উত্তরবঙ্গের উপভাষা অংশতঃ অপিনিহিতির স্তর পর্যন্তই অগ্রসর হয়েছে। অভিশ্রুতি এই উপভাষায় ঘটেনি।

উত্তরবঙ্গের উপভাষা	শিষ্ট বাংলা
কালি/কাইল্	কাল
আজি/আইজ্	আজ
রাতি/রাইত্	রাত
করিয়া/করি	ক'রে
জলুয়া	জোলো ইত্যাদি।

রূপগত :-

(১) কর্ম, সম্প্রদান এবং অধিকরণ এই তিনটি কারকের বিভক্তি উত্তরবঙ্গের উপভাষা এবং [illegible] শিষ্ট বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণ -

	শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
কর্ম	কে(বাবাকে)	ক(বাবাক)

	শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
সম্প্রদান	কে(সাধুকে)	ক(সাধুক)
অধিকরণ	এ,তে(ঘরে,বাড়িতে)	ত(ঘরোত্‌,বাড়িত)

উল্লেখ্য যে পদের দ্বিত্ব ঘটলে উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও অধিকরণের বিভক্তি হিসেবে 'এ' ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- পায়ে-পায়ে 'পায়ে পায়ে', ঘরে-ঘরে 'ঘরে ঘরে' ইত্যাদি।

(২) শিষ্ট বাংলায় বচনভেদে ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় একমাত্র প্রথম পুরুষ ব্যতীত অন্য সব পুরুষের ক্ষেত্রেই বচনভেদে ক্রিয়ার রূপ ভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়। উদাহরণ-

শিষ্ট বাংলা		উত্তরবঙ্গের উপভাষা	
একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি যাই	আমরা যাই	মুই জাও্‌	হামরা জাই
তুই যাস	তোরা যাস	তুই জাইস্‌	তোমরা জান্‌ ইত্যাদি।

(৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়া বিভক্তি সমূহ শিষ্ট বাংলা এবং উত্তরবঙ্গের উপভাষা উভয়তঃই অভিন্ন হলেও বিবর্তনের ক্রমস্তুতিতে এ বিষয়ে উভয় ক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ-

	শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
উত্তম পুরুষ,বর্তমান কাল	করি	করোত্‌
উত্তম পুরুষ,অতীত কাল	করলাম	করনুত্‌
উত্তম পুরুষ,ভবিষ্যত কাল	করব	করিম্‌ ইত্যাদি।

বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'রূপতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ের ক্রিয়া পর্যায় দ্রষ্টব্য।

পদবিন্যাস গত ঃ-

(১) নঞর্থক অব্যয় 'না' শিষ্ট বাংলায় সাধারণতঃ ক্রিয়ার পরেই ব্যবহৃত হয়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বাক্যে নঞর্থক অব্যয় 'না' সাধারণভাবে ক্রিয়ার আগে বসে। উদাহরণ -

শিষ্ট বাংলা	উত্তরবঙ্গের উপভাষা
আমি যাব না	মুই না জাইম্‌
তুমি ভাত খেও না	তুই ভাত্‌ না খাইস্‌
সে বাড়ি যাবে না	উয়ায় বাড়ি না জাবে ইত্যাদি

(২) সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে শিষ্ট বাংলা অপেক্ষা উত্তরবঙ্গের উপভাষার পদবিন্যাসরীতি শিথিল। অর্থাৎ পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই উপভাষায় মোটামুটিভাবে একপ্রকারের শৃঙ্খলা থাকলেও এই শৃঙ্খলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্ষা করা হয় না। যেমন-'মুই ভাত্ না খাঙ্' এই বাক্যটিকে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় 'না খাঙ্ মুই ভাত্', 'ভাত্ না খাঙ্ মুই', 'ভাত্ মুই না খাঙ্', 'না খাঙ্ মুই ভাত্', 'মুই না খাঙ্ ভাত্' – ইত্যাদিরূপ বাক্যে উপস্থাপিত করা সম্ভব। এই ধরনের উপস্থাপনায় এক্ষেত্রে বাক্যরূপগত প্রভেদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই বাক্যটির অনুবাদ শিষ্ট বাংলায় 'ভাত খাইনা আমি' এবং 'আমি ভাত খাইনা' এই দুটি বাক্যের মাধ্যমেই সম্ভব।

শব্দভাণ্ডার :-

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় তৎসম, অর্ধতৎসম এবং বিদেশী শব্দের অনুপাত শিষ্ট বাংলা অপেক্ষা কম। পক্ষান্তরে তদ্ভব এবং দেশী শব্দের অনুপাত এই উপভাষায় শিষ্ট বাংলা অপেক্ষা বেশী। এছাড়া এই বিষয়ে শিষ্ট বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই।